বিষয় : বন্যা

তরল দর্পণে সমাজের মুখ

অনুপম মিশ্র

অনুবাদ : জয়া মিত্র

তরল দর্পণে সমাজের মুখ

অনুপম মিশ্র

অনুবাদ

জয়া মিত্র

আশাবরী

'TARAL DARPANE SAMAJER MUKH'
A Bengali Translation of
'TEHERNE WALA SAMAJ DUB RAHA HAI'

যুবা সংবাদ প্রকাশন কর্তৃক হিন্দীভাষায় প্রকাশিত বই
'ত্যারনে ওয়ালা সমাজ ডুব রহা হ্যায়'- এর বাংলা অনুবাদ ।

লেখক : অনুপম মিশ্র
অনুবাদ: জয়া মিত্র
প্রচ্ছদ: দিলীপ চিঞ্চলকর
[redacted]
বাংলায় প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৯ (March 2009)
প্রকাশক: আশাবরী, নেতাজী সুভাষ রোড, পুরুলিয়া - ৭২৩১০২, পশ্চিমবঙ্গ
Netaji Subhas Road. Purulia-723102. (W..B).
কথা: (০৩২৫২) ২২৬৮৪৮/৯৪৩৪৩২৩৯৯৯/৯৪৭৪৫০৯৩২৩
(03252) 226848/ 9434323999/ 9474509323
মুদ্রক: ডি এন্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, উত্তর ২৪পরগনা, কলি ১৩২

মূল্য: ১৫ টাকা

ভূমিকা

এই লেখাটির রচনাকাল অবিশ্বাস্য হলেও ২০০৪সাল। ২০০৮সালের ৮সেপ্টেম্বর থেকে কোশি নদীর প্রলয়ঙ্কর বন্যা ও তারপর দু'মাস বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলে ডুবে থাকাকে যতই 'আকস্মিক বিপর্যয়' বলে প্রচার করা হোক প্রকৃতপক্ষে এটি দীর্ঘকাল ধরে নদীর সঙ্গে ভুল বাবহার করার অনিবার্য ফল— একথা লেখাটিতে স্পষ্ট এবং এই প্রলয়বন্যার সংকেতও নদী দিচ্ছিল বহুদিন ধরে। এ রাজ্যের ২০০০ ও ২০০২সালের বন্যার কথা আমাদের খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। ২০০৮সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হীরাকুদ বাঁধ থেকে একবারে সাড়ে চার লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার ফলে উড়িষ্যার বীভৎস বন্যা, মহারাষ্ট্র গুজরাটের বন্যা— মাটি ও জলের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে ফেলার দরুণ পর পর এসব ঘটনা। যার ফলে সর্বস্বহারা হচ্ছেন, প্রাণ হারাচ্ছেন কোটি কোটি মানুষ। আর ত্রাণের নামে বেশিরভাগটাই কিছু কুচ্ছিত নির্লজ্জ ব্যবসাপত্র চলে। এবং সেই নির্দিষ্ট সময়টি পার হয়ে গেলেই এ বিষয়ে আর কোন কথাবার্তা হয় না, যতক্ষণ না পরের বন্যা শুরু হচ্ছে।

বন্যা নদীর স্বাভাবিক ধর্ম। তার সঙ্গে মিলেমিশে বাস করছে মানুষ। তার প্রসাদে গড়ে উঠছে সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি। আজকে তাহলে সেই বন্যার জন্য এই ক্রমবর্ধমান দুর্দষার কারণ কী? এই প্রশ্নগুলির দিকনির্দেশক হিসেবে অনুপমজীর লেখাটি পাঠকদের মনকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

জয়া মিত্র

কথায় কথায়

সেদিন এক অধ্যাপক বলছিলেন লোকবিজ্ঞানের মধ্যে স্থানিকতা এমন অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত থাকে যে তাকে স্থানিকতা মুক্ত করে বিস্তির্ণ প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা কঠিন কাজ। এখানেই হয়ত লোকবিজ্ঞানের প্রকরণের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার বিমূর্ত ধারণার কোথাও মেল বন্ধন ঘটানো দরকার। পরিতাপের বিষয় বিদ্যাচর্চার এই দুটি ধারা এখনও পরস্পরকে প্রয়োজনীয় মান্যতা দেয় না— এই দুটি ধারার মধ্যে সার্থক কথপোকথন এখনও অনুপস্থিত। এ সমাজেরই ক্ষতি।

আর তাই প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা যখন লোক বিজ্ঞান, লোকজ জীবনধারার কোন রকম খোঁজ খবর না রেখে তার প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান সেই বিশেষ স্থানের ওপর চাপিয়ে দেয় সে ক্ষতির রূপটিও ভয়াভয়। সেই ছবিটিই আমরা দেখতে পাই অনুপম মিশ্রের লেখা 'ত্যারনে ওয়ালা সমাজ ডুব রহা হ্যায়' বইটিতে।

২০০৪সালে লেখাটি প্রবন্ধাকারে ছাপে 'জনসত্তা'। ২০০৫সালে পেঙ্গুইন বুক থেকে প্রকাশিত অনুপম মিশ্রের বই 'সাফ মাথে কা সমাজ'-এ। এরপর আরও কিছু পত্র-পত্রিকাও ছাপে এবং ২০০৮-এর মে মাসে বই আকারে প্রথম সংস্করণে ছাপা হল ২০০০কপি। এরপরই ২০০৮আগস্টের সেই ভয়াভয় বন্যার পর মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টায় দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০কপি হল অক্টোবর, ২০০৮সালে।

অনুপম মিশ্রের শব্দ চয়নের যে মগ্নতা— ভাষান্তর করতে গিয়ে হাবুডুবু খেতে হয় বারে বারে। এই বইটির নামকরণ করেছেন 'ত্যারনে ওয়ালা সমাজ ডুব রহা হ্যায়' আপাত দৃষ্টিতে সপাট সরল ছোট্ট এই একটি বাক্যেই কি আবেগ মথিত গভীর আক্ষেপের সঙ্গে পুরো চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কি গভীর ব্যাঞ্জনা। এই ব্যাঞ্জনাটুকুকে সম্বল করেই আমরা বাংলায় নামকরণ করলাম 'তরল দর্পণে সমাজের মুখ'।

'আশাবরী' অনুপম মিশ্রেম আরও একটি বই প্রকাশ করতে পেরে গর্বিত।

এই একই মলাটে অনুপম মিশ্রের পরিবেশ বিষয়ে আরও একটি প্রবন্ধও রইল।

প্রকাশক

সমাজ ও নদী
বন্যার পথের মাঝখানে

লেখক পরিচিতি

অনুপম মিশ্রের জন্ম ১৯৪৮সালে মধ্যপ্রদেশে। স্বাধীনতাসংগ্রামী আদর্শবাদী পরিবার থেকে আশ্রমিক পরিবেশে ছোটবেলা কাটে। বাবা ভবানীপ্রসাদ মিশ্র হিন্দী ভাষায় এক ভিন্ন ধারার কবি হিসাবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। ১৯৭৭সাল থেকে তিনি দিল্লির 'গান্ধি শান্তি প্রতিষ্ঠান'-এর পরিবেশ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। ষাট-সত্তরের বিশ্বব্যপী চিন্তা বিপ্লবের কাছে এই মানুষটি আলাদা রকম ভাবে গ্রাম ও গ্রামের মানুষজনদের মধ্য দিয়ে দেশ বা সমাজকে দেখতে শেখেন। 'চিপকো' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। সে সময় থেকেই তিনি প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সমাজের ও তার জীবিকার প্রশ্নটি বুঝবার চেষ্টা শুরু করেন— যখন 'পরিবেশ' বিষয়ে ভাবনাচিন্তা আমাদের দেশে প্রায় কেউই করেননি। পৃথিবীতেও তখন উত্তর সত্তরের এ আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেনি।

অনুপম মিশ্রের বিশিষ্টতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে। ১৯৮২সালে দিল্লীর সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট সংস্থার অনিল অগ্রওয়াল কৃত 'স্টেট অব ইন্ডিয়াজ এনভায়রনমেন্ট সিটিজেন্‌স রিপোর্ট' ১ম ও ২য় খণ্ডের হিন্দী সংস্করণটি তিনি তৈরী করে তোলেন। 'হমারা পর্যাবরণ'(আমাদের পরিবেশ) নামে গান্ধি শান্তি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত এই বইটির পুস্তানির কাগজ থেকে নির্দেশিকার শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠক একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবনার বই হাতে পান। উৎসর্গ পত্রটি ছিল 'নিজভূমে পরবাসী হয়ে যাওয়া সমাজ'কে সমর্পিত। এবং এই বোধহয় প্রথম আমরা কাছাকাছির কোনো একটি বই দেখি যাতে লেখা ছিল— 'এই বইয়েরর কোনো গ্রন্থস্বত্ব নেই। যে কেউ প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারেন।' যে চিন্তা থেকে এইগুলি ঘটেছিল সেই মূল দৃষ্টিভঙ্গিই অনুপম মিশ্রের বিশিষ্টতা। তাঁর ছোট-বড় ১৭টি বইয়ের প্রত্যেকটিতেই সেই দৃষ্টিভঙ্গি স্বপ্রকাশ। বস্তুতপক্ষে দেশকে - তার প্রকৃতি পরিবেশকে, বাইরে থেকে, ওপর থেকে খণ্ড খণ্ড করে না দেখে, ভিতরের দিক থেকে বোঝা;— ভারতের সুপ্রাচীন কৃষিসভ্যতার ধারক মানুষদের অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে সম্মান করতে শেখা ও একটি সমাজের এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তার ভাষা, তার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সম্পর্কের এক সামগ্রিক সম্পর্ক নির্ণয়, এদেশে এই বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের প্রধান দার্শনিকদের মধ্যে দিল্লির এই মিতবাক অন্তর্মুখী সুনম্র মানুষটি একজন।

বাংলায় অনুপম মিশ্রের বই

'আজও পুকুর আমাদের'

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন, ২০০৫

'রাজস্থানের রজত বিন্দু'

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

'কুণ্ড'

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০৪
ও
আর্থ কেয়ার বুকস
১০মিডলটন ষ্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১,
কথা-(০৩৩)২২২৯৬৫৫১
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ, ২০০৯

'লাপোডিয়া'

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

প্রকাশক : আশাবরী
নেতাজী সুভাষ রোড। পুরুলিয়া - ৭২৩১০২। পশ্চিমবঙ্গ।
Netajee Subhus Road. Purulia-723102. (W..B).
কথা - (০৩২৫২) ২২৬৮৪৮/৯৪৭৪৫০৯৩২৩/ ৯৪৪৩৩২৩৯৯৯
Dial - (03252) 226848/ 9474509323/ 9434323999

জুলাই মাসের প্রথমাংশে উত্তর বিহারে যে ভয়ংকর বান এসেছিল, তা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। লোকে সে কথা প্রায় ভুলতেও বসেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে উত্তর-বিহার ওই বন্যার মূল লক্ষ্য ছিল না। তা ছিল প্রথম দিকের একটা অংশ মাত্র। বন্যা শুরু হয় নেপাল থেকে। তারপর সেটা উত্তর-বিহারে নামে, তারপর বাংলায়। সবশেষে সেপ্টেম্বরের শেষ কিংবা অক্টোবরের শুরুতে তা বাংলাদেশকে লণ্ডভণ্ড করে শেষ অবধি সাগরে গিয়ে মিশে। এবছর উত্তর-বিহারে বন্যার তাণ্ডব খুবই ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন পর্যন্ত এটাই ছিল লোকের আলোচনার প্রধান বিষয়। যেমন হয় আর কী। হেলিকপ্টারে দেখে যাওয়া-টাওয়াও হল। তারপর যথা নিয়মে আমরা সে সব ভুলে গেলাম।

বন্যা কিন্তু আমাদের অ-তিথি নয়। সে কখনোই আকস্মিকভাবে এসে পড়ে না। হ্যাঁ, দু'চারদিনের এদিক-ওদিক হয় সেকথা আলাদা, কিন্তু বন্যা আসবার দিনক্ষণ মোটামুটি ঠিকঠাকই থাকে। অথচ বন্যা এসে পড়লে আমরা এমন একটা ভাব করি যেন বন্যা একটা আকস্মিক বিপর্যয়। আগে থেকে যেভাবে তৈরি থাকার কথা আমাদের দিক থেকে তার কিছুই করা থাকে না। কাজেই বন্যার বিধ্বংস দিনে দিনে বাড়ছে। আগে হয়তো আমাদের সমাজ এতো বড়ো প্রশাসন ছাড়াই বা বলা যায় এমন 'নিস্কর্মা প্রশাসন' ছাড়াই, নিজেদের ব্যবস্থাপনা করতে যথেষ্ট দড় ছিল। সেই কারণে বন্যার সময় এমন 'গেল গেল' রব উঠতে দেখা যেত না।

বন্যা কিন্তু আমাদের অ-তিথি নয়। সে কখনোই আকস্মিকভাবে এসে পড়ে না। হ্যাঁ, দু'চারদিনের এদিক-ওদিক হয় সেকথা আলাদা, কিন্তু বন্যা আসবার দিনক্ষণ মোটামুটি ঠিকঠাকই থাকে। অথচ বন্যা এসে পড়লে আমরা এমন একটা ভাব করি যেন বন্যা একটা আকস্মিক বিপর্যয়। তাই আগে থেকে যে প্রস্তুতি দরকার ছিল তা হয় না।

বন্যার ধ্বংসলীলা বাড়বার আরো কিছু কারণ আছে।

এবারের বন্যা উত্তর-বিহারকে যেন এক অভিশপ্ত এলাকার মতো ছেড়ে গিয়েছে। বন্যা মোকাবিলার কোনো ব্যবস্থা কোথাও ছিল না-এই বিষয় নিয়ে সর্বত্র

আলোচনা চলেছে। অব্যবস্থার কিছু কিছু কারণের কথাও বলা হয়েছে— অসহায়তা, দারিদ্র্য ইত্যাদি।

আজ হয়তো অনেকেই জানেন না যে উত্তর-বিহার এক সময়ে এক অতি সমৃদ্ধ এলাকা ছিল। মজঃফরপুরের লিচু, পুসাঢোলির আখ, দ্বারভাঙার শাহবসন্ত ধান, মিষ্টি আলু, আম, চিনিকলা, বাদাম আর এই অঞ্চলেরই কিছু কিছু জায়গায় চাষ হত সেই তামাক যার নেশা একেবারে শরীরের আপাদমস্তক চড়ে যায়। সিলোতের পাতলা চিঁড়ে, যার সম্পর্কে ঠাট্টা করে বলা হতো যে নিঃশ্বাসের বাতাসে উড়ে যায়। তার স্বাদের তো কোনো তুলনাই হবে না। সেখানকার ধানও ছিল এমন যে বন্যার জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকতো, শেষে বন্যাকে বিদায় করে এসে খামারে উঠতো। তার উপর ছিল দিয়ারার সম্পন্ন উর্বর এলাকা।

সুধী পাঠক এই তালিকাকে আরও অনেকখানি বাড়িয়ে নিতে পারেন। তার সঙ্গে যদি পাট, শন আর নীল জুড়ে নেন তো দেখবেন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো' মানে 'লম্বা' প্ল্যাটফর্মের ওপর। এরকম সমৃদ্ধ একটি এলাকা উত্তর-বিহার আজকের এই দুর্দশায় পৌঁছল কী করে? শোনপুর স্টেশনের প্ল্যাটফম— লোকে বলত এটা নাকি আমাদের দেশের দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম ছিল, ইংরেজদের আমলে তৈরী হয়। কেন তৈরী হয়েছিল এতোবড়ো প্ল্যাটফর্ম? তৈরী হয়েছিল এই অতিসমৃদ্ধ এলাকার কৃষিজ উৎপাদনগুলি রেলের সাহায্যে দেশের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় চালান দেবার জন্য। কিন্তু আজকে সেই জায়গাটিরই দুর্দশা নিয়ে আমরা এতটুকুও গভীর ভাবে ভাবতে রাজী নই। তাকে 'অসহায় গরীব' বলে ছেড়ে দিয়ে হাত ধুয়ে বসে আছি।

বন্যা হলে সবথেকে প্রথম আমরা নেপালকে দোষ দিই। নেপাল একটা ছোট দেশ। কতদিন পর্যন্ত আমরা এই ভয়ংকর বন্যার জন্য নেপালকে দোষ দিতে থাকব! বলা হয় নেপাল জল ছাড়ছে বলে আমাদের এখানে বন্যা হচ্ছে। এটা ভাববার কথা যে নেপাল কতটা জল ছাড়তে পারে। আমরা এটা বলতে পারি নেপাল হল এই বন্যার প্রথম ভুক্তভোগী। সেখানে হিমালয়ের চূড়াগুলির উপর বর্ষার যে জল ঝরে পড়ে তা আটকে রাখবার সাধ্য অথবা সাধন(অর্থ)কোনোটাই নেপালের নেই। আটকানোর সম্ভবত কোনো প্রয়োজনও নেই। ওই জলকে বাধা দিতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বৈ কমবে না। সুতরাং নেপালের ঘাড়ে দোষ দেবার অভ্যাসটা আমাদের ছাড়তে হবে।

নেপাল যদি জল আটকায় তাহলে আগামী দিনে আমাদের আরও বড়ো বন্যার কবলে পড়বার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সকলেই জানেন যে হিমালয়ের এই অংশ

এখনো তৈরী হচ্ছে, এখানে সবচেয়ে যত্ন নিয়ে বানানো বাঁধও প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম আন্দোলনে নিমেষের মধ্যে ভেঙে পড়বে। সে ক্ষেত্রে আজকের চেয়ে অনেক ভয়ংকর আকারের প্লাবনের মুখে পড়তে হবে আমাদের। নেপালকে দোষী বলে ধরলে অন্তত পক্ষে বিহারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার এক বড়ো ভাগ— টাকা পয়সা, ইঞ্জিনিয়ীর-টেকনিশিয়ান, নেতারা সহ— এপ্রিল মে মাসে নেপাল যাওয়া উচিত। যাতে বিহারে বন্যার বিপদকে নেপালেই আটকে দেবার কোনো পাকাপাকি ব্যবস্থা করা যায়। বন্ধুত্বপুর্ণ আলোচনা হোক। টেকনিক্যাল জায়গা থেকে প্রথমে খোলাখুলি কথাবার্তা হোক তারপর মে মাসেই প্রধানমন্ত্রী না হলেও অন্তত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেপালে যান ও পরবর্তী জুলাইয়ে আসন্ন বন্যার সমস্যা নিয়ে কথা বলুন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা রয়েছি বন্যার পথের ঠিক মাঝখানে। উত্তর বিহারের আগে নেপালেও অনেক মানুষ মারা গিয়েছেন বন্যায়। গত বছর নেপালে ভয়ংকর ধস্ হয়েছিল। তখনই আমাদের খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে পরের বছর আমাদের বিপদে পড়তে হবে। কারণ হিমালয়ের এই ঝুরঝুরে অংশে যত ধস্ নামবে সে সব মাটি পাথরের স্তূপ সেই সেই জায়গাতেই পড়ে থাকবে যতক্ষণ না পরের বর্ষার জল তাকে ভাসিয়ে নিয়ে নামে।

ফলে এই নদীগুলোর জলের বেগ, তার ক্ষমতা, তার সঙ্গে হিমালয়ের সবচেয়ে ভঙ্গুর অংশ শিবালিক পর্বতমালার থেকে বয়ে আসা মাটি ও পলির পরিমাণ —কোনো কিছুই উত্তর-পুর্ব কিংবা পশ্চিমী হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়না।

উত্তর বিহারের পরিস্থিতিও আলাদা মনোযোগ দাবি করে। অসংখ্য নদী হিমালয় পর্বত থেকে সরাসরি এইখানে এসে সমতলে নামে। এদের নামবার ধরনের একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়— পাঠশালায় যেমন বাচ্চাদের জন্য টিনের স্লিপ থাকে, নদীরাও যেন ঠিক সেরকমই হিমবাহগুলির মসৃণ স্লিপ থেকে পাহাড় বেয়ে ধমাধম এই উত্তর বিহারের মাটিতে আছড়ে পড়ে। এই অংশ অর্থাৎ নেপালেই হিমালয়ের উচ্চতম চূড়াগুলি রয়েছে আর সবচেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে সেই উচ্চতা পার করে অসংখ্য নদী হু হু করে উত্তর ভারতে নেমে আসছে। ফলে এই নদীগুলোর জলের বেগ, তার ক্ষমতা, তার সঙ্গে হিমালয়ের সবচেয়ে ভঙ্গুর অংশ শিবালিক পর্বতমালার থেকে বয়ে আসা মাটি ও পলির পরিমাণ— কোনো কিছুই উত্তর-পুর্ব কিংবা পশ্চিমী হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়না।

এক তো এটি সবচেয়ে উঁচু এলাকা, তার উপর ভঙ্গুর। উপরন্তু এটি ফল্টলাইনের উপরে অবস্থিত। এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি ঠিক সেরকম যেখান থেকে হিমালয়ের জন্ম হয়েছিল। কারো কারো মনে হতে পারে যে আমাদের সমাজও ভূ-বিজ্ঞান বা জিওমরফোলজি যথেষ্ট ভালোভাবে বুঝতো। এইখানে একাদশ শতাব্দীর তৈরী বরাহ অবতারের মন্দির আছে যা অন্য কোথাও চট করে দেখা যায় না। কয়েক কোটি বছর আগে কিছু ভূতাত্ত্বিক ঘটনার দরুণ এই অংশটি হিমালয়ের রুপ ধরেছে। এখান থেকে জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে নদীগুলো। তারা সটান দৌড়ে আসে, নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। তাতে তাদের শক্তি বেড়ে ওঠে আরও। বলা হয় যে যখন হিমালয় তৈরী হয়েছিল, তখন তার তিনটে ভাঁজ (স্তর) ছিল। যেমন মধ্যপ্রদেশে সাতপুরা সেরকম, এরও তিনটে স্তর ছিল। সবচেয়ে গভীরের, মধ্য, আর বাহ্য। এই বাহ্য বা বাইরের অংশ শিবালিককেই সবচেয়ে দুর্বল বলে ধরা হয়। ভূগোলের পরিভাষায় এমনিতেও বিন্ধ্য বা সাতপুরার তুলনায় হিমালয়কে বলাহয় তরুণ পর্বত। মাসের বারোটা পাতা পার হয়ে গেলে আমাদের সুন্দরতম ক্যালেন্ডারও আমরা দেওয়াল থেকে নামিয়ে ফেলি। কিন্তু প্রকৃতির ক্যালেন্ডারে হয়তো লক্ষ লক্ষ বছরের এক একটি পাতা। সেই ক্যালেন্ডারের হিসাবে আরাবল্লির বয়স নব্বই বছর। আর হিমালয় ? এখনো চার পাঁচ বছরের দুর্দান্ত দুষ্টু বাচ্চা। এখনো বাড়ছে, পড়ছে, উঠছে। চঞ্চল। তার চারদিকে নানামতো ভাঙচুর চলে। এখনও তার মধ্যে প্রৌঢ়তা বা বয়সের সংযম, ধীরতা, শান্ত সমাহীতভাব আসেনি। এজন্য হিমালয়ের এইসব নদী কেবল জলই নিয়ে আসে না, সঙ্গে পলি মাটি পাথর বিরাট বিরাট প্রস্তরস্তুপ নিয়ে আসে। উত্তর বিহারের সমাজ নিজের স্মৃতির মধ্যে এসব কথার হিসেব রেখেছে।

তারা এই প্রকৃতির সঙ্গেই খেলা করে,
মারা মারি করে জীবন কাটিয়ে নেবে।
এই ভাবনার মধ্যে কোথাও
কোনো অহংকার ছিল না।
কি করে এই প্রকৃতির কোলে
টিকে থাকতে পারবে
সেসব তারা দীর্ঘদিন ধরে
অভ্যাস করেছে। ক্ষণভঙ্গুর
এই সমাজ প্রকৃতির
কোটি কোটি বছরের
লীলার মধ্যে নিজেকে
অভ্যস্ত করে প্রৌঢ়প্রাজ্ঞতা অর্জন
করেছে। তারপর সেই প্রৌঢ়ত্বকে
সমর্পণ করেছে হিমালয়ের
শিশু স্বভাব চঞ্চলতার কোলে।

একে তো চঞ্চল শিশুর মতো হিমালয়, তার ওপর ঝুরঝুরে মাটি, উপরন্তু ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা— সর্বনাশের আর বাকি কী থাকে! হিমালয়ের এই অঞ্চলের নীচ দিয়েই ভূমিকম্পের একটি বড়ো প্লেট পার হয়েছে। দ্বিতীয় প্লেটটি এর সামান্য

ওপরের দিকে মধ্য হিমালয়ের নীচে। লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার ভয়ংকর ভূমিকম্প জনিত মাটি-পাথরের স্তূপ দিয়ে এই পুরো জায়গাটা তৈরী হয়েছে, হয়তো সেরকম বড়ো কোনো ভূমিকম্প আবার একদিন সমস্তটা ধ্বংসও করতে পারে। ভূ-বিজ্ঞান বলে যে আজ যেখানে উত্তর-বিহার আর নেপাল সেই অঞ্চলের সমস্ত মাটি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উথলে উঠেছিল আর পরস্পরের চাপে সেই কঠিন তরঙ্গগুলি উচ্চতার এক সীমা পর্যন্ত উঠে যায়। তারপর কিছু সময়ের জন্য স্থির হয়। এই 'স্থিরতা' তাণ্ডব নৃত্যের মাঝে এক লহমার মতো হয়তো। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে মায়োসিন যুগ বলে। সেই লক্ষ বছর আগে ঘটা ঘটনাকে উত্তর বিহারের লোকসমাজ নিজের স্মৃতিতে কোথাও বরাহ অবতারের কল্পনায় ধরে রেখেছে। টলে ওঠা যে ধরণীকে বরাহ নিজের তুলে ধরা থুতনি ও দাঁতের উপরে ধরে রক্ষা করেছিল, তা এখনও মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের স্মৃতি মানুষ এখনও মনে রেখেছে।

এখনকার সমাজ কিন্তু এই সমস্ত পরিস্থিতিকে নিজেদের জীবন চর্চায় জীবন দর্শনে ধীরে ধীরে মিশিয়ে নিয়েছে। প্রকৃতির বিশালতার মধ্যে একটি ছোট বিন্দুর মতো মিশিয়ে নিয়েছে নিজেকে। সে এই প্রকৃতির সঙ্গেই খেলা করে, মারামারি করে জীবন কাটিয়ে নেবে। এই ভাবনার মধ্যে কোথাও কোনো অহংকার ছিল না। কি করে এই প্রকৃতির কোলে সে টিকে থাকতে পারবে সেসব সে নিজে দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করেছে। ক্ষণভঙ্গুর এই সমাজ প্রকৃতির কোটি কোটি বছরের লীলার মধ্যে নিজেকে অভ্যস্ত করে প্রৌঢ়প্রাজ্ঞতা অর্জন করেছে। তারপর সেই প্রৌঢ়ত্বকে সমর্পণ করেছে হিমালয়ের শিশুস্বভাব চঞ্চলতার কোলে।

কিন্তু গত একশো-দেড়শো বছরে আমাদের এই সমাজে এমন বহু কাজ হয়েছে যাতে সেই স্বভাব-নম্রতার বদল ঘটেছে, তার স্বভাবের মধ্যে দেখা দিচ্ছে কিছু অহংকার। হয়তো সমাজের মনে নয়, কিন্তু তার নেতাদের মনে, পরিকল্পনাবিদ্‌দের মনে অহংকার অবশ্যই দেখা দিয়েছে যে তারা প্রকৃতির নিয়ম বা বিশেষত্বগুলি লঙ্ঘন করার ক্ষমতা রাখেন।

সমাজ বহু প্রজন্ম ধরে,
বহু সতাব্দী ধরে
এখানে স্কুলের স্লিপ থেকে
পিছলে নেমে আসা
বাচ্চাদের মতো নদীদের সঙ্গে
মিলেমিশে থাকবার,
বন্যার সঙ্গে বাঁচবার ধরণ
অভ্যাস করেছিল।
তারা আর তাদের ফসল
বন্যায় ডুবে না গিয়ে,
ঢেউয়ের উপর সাঁতার দিতে পারত।
সে সব আজ ধীরে ধীরে
শেষ হতে বসেছে।

সমাজ বহু প্রজন্ম ধরে, বহু শতাব্দী ধরে এখানে স্কুলের স্লিপ থেকে পিছলে নেমে আসা বাচ্চাদের মতো নদীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার, বন্যার সঙ্গে বাঁচবার ধরণ অভ্যাস করেছিল। তারা আর তাদের ফসল বন্যায় ডুবে না গিয়ে, ঢেউয়ের উপর সাঁতার দিতে পারত। সে সব আজ ধীরে ধীরে শেষ হতে বসেছে।

উত্তর বিহারে হিমালয় থেকে নেমে আসা নদী অগণন। তাদের গুনে শেষ কার যাবে না, তবু কিছু লোক তাদের গুনেছে। বর্তমানে মানুষ ভাবে যে দুঃখদুর্দশা ছাড়া এই সব নদী মানুষকে আর কিছু দেয় না। কিন্তু এইসব নদীর নামগুলো যদি খেয়াল করি তো দেখব একটি নামেরও শব্দে কিংবা অর্থে কোনো দুঃখের আভাস নেই। নদীদের লোকে দেখে দেবীর মতো। তাদের বিশেষণগুলো যদি আমরা অন্যদিক বিচার করে দেখি তাহলে তার মধ্যে এমন অনেক শব্দ পাব যা দিয়ে সমাজের সঙ্গে এই সব নদীর সম্পর্কের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কিছু নাম সংস্কৃত থেকে এসেছে। কতগুলো সে সব নদীর গুণ প্রকাশ করে। দু- একটা হয়তো দোষও।

নদীদের নামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় নাম হল— গয়নার। এই গয়নাগুলোর বেশির ভাগই আবার হাঁসুলি, আংটি, বালা, কি চন্দ্রহার ধরণের। এ সব অলংকারের আকার প্রায় গোল— অর্থাৎ নদীর প্রবাহ সোজা সিধে না হয়ে গোল গোল বাঁক নিয়ে বয়ে যাচ্ছে গ্রামের পাশ দিয়ে। গ্রামগুলিকে যেন অলংকারে সাজিয়ে তুলেছে। উত্তর বিহারের অনেক গ্রাম এই নদীর আভূষণে এমন সাজানো যে পা না ধুয়ে, বাইরের ধুলো (হতে পারে অপবিত্র!)পায়ে নিয়ে আপনি যেন গ্রামে না ঢোকেন। আবার কোথাও হয়তো নিতান্ত ব্যবহারিক কোনো নাম। একটি নদীর নাম গোমুত্রিকা— যেন কোনো গরু চলতে চলতে প্রস্রাব করেছে এমন আঁকা বাঁকা সেই নদীর প্রবাহ। এরকমই এক একটা নদীর স্বভাব মনে রেখে লোকে তাদের নাম রেখেছিল।

একে তো নদীর স্বভাব এরকম তার ওপরে ওপর থেকে বয়ে আসা পলির জন্য কিছু কিছু নদী নিজের রাস্তা পাল্টায়। কোশী নদীর কথায় বলা হয় যে বিগত কয়েকশো বছরে ১৪৮ কিলোমিটার জুড়ে এ নিজের ধারা পাল্টেছে। উত্তর বিহারের দুটি জেলায় এমন এক ইঞ্চি জমি নেই যা কখনো না কখনো কোশির ধারায় সিঞ্চিত হয়নি। এরকম সব নদীকে কোনো বাঁধ বা তটবন্ধ দিয়ে বাঁধবার কথা ভাবাটাই উদ্ভট বলে মনে হয়। সমাজ এই নদীগুলিকে দেখেছে— অভিশাপের মতো নয়, বরদানের মতো করে। কৃতজ্ঞ চিত্তে। সমাজ এই কথা মনে রেখেছে যে এইসব নদীই হিমালয় পর্বত থেকে মাটি বয়ে এনে অমূল্য উর্বর চাষের জমি তৈরী করে দিয়েছে। এই বন্যা আর পলিমাটির জন্য মানুষের কাছে নদী যেন মাথার মণি। লোকে বলে এই নদীর প্রসাদেই সম্পূর্ণ দারভাঙা জেলা চাষযোগ্য জমিতে সমৃদ্ধ। এর মধ্যেও সমাজ খেয়াল রেখেছিল

কোন্ কোন্ নদী অপেক্ষাকৃত কম পলি আনে।

এরকম নদীর মধ্যে একটির নাম খিরোদী। লোকে বলে এর নামকরণ হয়েছে ক্ষীর, মানে দুধ থেকে। কারণ এ নদীর জল স্বচ্ছ। পরিষ্কার। একটি নদীর নাম জীবছ। হয়তো জীব-ইচ্ছা কিংবা জীবাত্মা থেকে হয়েছে। সোনবরসাও আছে। এইসব নদীদের কারো নামেই কিন্তু বন্যার দুঃখ দুর্দশার কোনো চিহ্ন নেই। বরং নদীর মতোই শব্দগুলিও লালিত্যে ভরপুর।

মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিকে নিয়ে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। সেটা এরকম— জীবনের সায়াহ্নে এসে কবি যখন অসুস্থ হলেন তখন স্থির করলেন নদীতেই প্রাণ বিসর্জন করবেন তিনি। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য নদীর দিকে চললেন বিদ্যাপতি। কিন্তু শারীরিক অবস্থা তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়াল। শেষ অবধি পৌঁছতে পারলেন না। তখন কবি নদীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন— হে মা, যদি আমার সাহিত্য রচনায় কোনো শক্তি থেকে থাকে, কোনো পুণ্য যদি জীবনে অর্জন করে থাকি আমি তাহলে তুমি আমাকে নাও। নদী কবির প্রার্থনা শুনল। এগিয়ে এসে কবির রোগতপ্ত শরীরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্রোতধারা। এ ধরণের অজস্র প্রচলিত গল্প নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের অপরূপ অভিজ্ঞান।

উত্তর বিহার জুড়ে বিহার করে নদীকুল, সেইখানে তারা খেলে, ছুটোছুটি করে, পুরো এলাকাটাই যেন তাদের নিজেদের। তার ফলে ওখানে তারা জায়গা থেকে একটু সরে গেলে সেটাকে কেউ 'পথ পরিবর্তন' বলে ধরে না। উত্তর বিহারের জীবনের একটি সুন্দর দর্পণ যদি হয় সেখানকার সাহিত্য, অন্য একটি তরল দর্পণ তাহলে এখানকার নদীমালা। এই অসংখ্য নদীতে সমাজ আপন মুখ দেখত আর চঞ্চল কল্লোলিত স্রোতস্বিনীর স্বভাব বড়ো ভালোবাসায় এঁকে নিত নিজের মানসপটে। তাই

একটি নদী নিজের পথ
ছেড়ে সরে আসে
মৃত্যুপথযাত্রী কোন কবির প্রর্থনায়,
কিংবা পুরোন পথ
ছেড়ে সরে যাওয়া নদী
আবার খাতে ফিরে আসে
সাধারণ মানুষদের আগ্রহে,
নদীর এই চলনকে
তীরবাসী মানুষেরা
সাধারণভাবেই মেনে নিত।
এই খেয়ালিপনা জেনেই
তাদের সঙ্গে বসবাস করা লোকেদের
কাছে স্বাভাবিক ছিল।

কখনো কবি বিদ্যাপতির মর্মস্পর্শী কাহিনী গাঁথা হয়েছে, কখনো ফুলপরাসের মত মধুর গাথা নদীতীরের বালিতে আঁকা রয়েছে। জল সেই বালিরেখাকে ধুয়ে দেয়নি বরং নিত্যসিঞ্চনে শিলালিপি করে তুলেছে তাকে। সে শিলালিপির কথা ইতিহাস

বইয়ে লেখা থাকুক নাই থাকুক, লোকস্মৃতিতে অবশ্য রয়ে গিয়েছে। ফুলপরাসের উপাখ্যানটি এখানে আবার বলা যায়।

ভুতহী নদী একবার ফুলপরাস নামের জায়গা থেকে নিজের পুরোন পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যায়। ভুতহীকে ফিরে আসবার অনুরোধ উপরোধ জানিয়ে পূজো, যজ্ঞ আরম্ভ হল। সেই মিনতিতে সাড়া দিয়ে আবার ফুলপরাসে ফিরে এল ভুতহী।

যে দেশে অজস্র নদী
সব নিয়ম ভেঙ্গে
কখনও এখান দিয়ে
কখনও ওখান দিয়ে বইতে থেকে,
সেখানেই আবার
এমনও নদী আছে যে নিজের
ধারা ছেড়ে এক পা-ও
এদিক ওদিক যায় না।
তার নাম হয়ে গেছে—
ধর্মমূলা।

এসব উপাখ্যানের গুরুত্ব এই যে, একটি নদী নিজের পথ ছেড়ে সরে আসে মৃত্যুপথযাত্রী কোন কবির প্রার্থনায়, কিংবা পুরোন পথ ছেড়ে সরে যাওয়া নদী আবার খাতে ফিরে আসে সাধারণ মানুষদের আগ্রহে, নদীর এই চলনকে তীরবাসী মানুষেরা সাধারণভাবেই মেনে নিত। এই খেয়ালিপনা জেনেই তাদের সঙ্গে বসবাস করা লোকেদের কাছে স্বাভাবিক ছিল। উপাখ্যানমালা আমাদের নির্দেশ করে যে যা কিছু ভুলে গিয়েছ তাকে আবার মনে করো।

কিছু কিছু নদীর বিচিত্র নাম সমাজ হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দিয়েছে। এমনই এক নদীর নাম অমরবেল ('বেল' অর্থ লতা- অনুবাদক)। কোথাও কোথাও একে আকাশবেলও বলে। লোকশ্রুতি এই যে এ নদীর উৎস বা সঙ্গম কেউ চোখে দেখেনি। বর্ষাকালে হঠাৎ কোথা থেকে এ আবির্ভূত হয় আর গাছের ওপর ছেয়ে যাওয়া সোনালি লতার মতই একটা বিরাট এলাকা জুড়ে নানা ধারায় বইতে শুরু করে। আবার এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরের বছর যে আবার ঠিক সেই পুরোন খাতগুলি দিয়েই বইবে তারও কোন মানে নেই। তখন হয়তো নিজের অন্য পথের হাল খুঁজে নেবে। একটি নদীর নাম দস্যু নদী। এ নাকি দস্যুর মত অন্য অন্য নদীদের জলবৈভব হরণ করে। এ জন্য পুরোন কিছু সাহিত্যে একে বৈভবহরণ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার একেবারে চলিত শব্দে নদীর নামও বিরল নয়। একটি নদীর নাম মরণে। কারো নাম মরণগঙ্গা। ভূতহা বা ভূতহীর কথা তো আগে বলাই হল।[১] যে দেশে অজস্র নদী সব নিয়ম ভেঙ্গে কখনও এখান দিয়ে কখনও ওখান দিয়ে বইতে থেকে, সেখানেই আবার এমনও নদী আছে যে নিজের ধারা ছেড়ে এক পা-ও এদিক ওদিক যায় না। তার নাম হয়ে গেছে— ধর্মমূলা।

এই ভূগোলজ্ঞানী সমাজ আজ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এঁরা মানতেন যে নদীরা কখনও জীবন্ত থাকে, প্রকাশ হয়, কখনও বা অদৃশ্যও হয়ে যেতে পারে। নদী মরে যায়, ভূতও হয়ে যায় এমনকি। এরকম সব হবার কারণ এই যে নদীর ধারার সঙ্গে ওপর থেকে বয়ে আসা মাটিতে নদীর খাত ভরে যাওয়া কিংবা ভাঙন দুইই চলতে থাকে দ্রুত এবং নিরন্তর। তাই নদীর রূপও বারে বারে বদলায়।

অনেক ছোট ছোট নদীর বর্ণনাতেও এমন কথা বলা হত যে এর দহে হাতি পড়লেও ডুবে যাবে। সেই সব ছোট নদীতেও বর্ষায় পাথরের বিরাট বিরাট খণ্ড বয়ে আসে আর জলের তোড়ে যখন তারা একটা অন্যটার সঙ্গে ধাক্কা খায় তখনকার বিকট শব্দে আকাশেরও কানে তালা লেগে যায়। আবার কিছু নদীর ব্যাপারে লোকে বলে যে বর্ষাকালে সে সব নদীতে এত কুমীর আসে যে জল ভর্তি করে গোবরের মত কুমীরের নাক নাহলে থুতনি কি লেজের ডগা ভেসে থাকে। এই নদীগুলি বর্ষার সময় প্রায়ই একটা অন্যটার সঙ্গে মিশে যেত - জল দেওয়ানেওয়া করত। বর্ষার নদীদের এই খেলাধুলোকে আজ আমরা 'ভয়ংকর বন্যা' বলে আখ্যা দিয়েছি। বরাহীক্ষেত্রের[২] মানুষরা এই খেলাকে অন্যভাবে দেখতেন। মানুষ এখানে বন্যার জন্য অপেক্ষা করত।

এইসব নদীতে এসে পড়া বন্যার বিশাল জলকে লোকেরা বড় বড় পুকুর দীঘি কেটে নদীর পথ থেকে সরিয়ে নিতেন। তাতে বন্যার ধ্বংসলীলা কিছু কম হত। পুরোনো ভাষায় একটা কথা ছিল 'চারকোসী ঝাড়ি'। নতুনরা, কমবয়সীরা - এ বিষয়ে বিশেষ কিছু শোনেননি। এলাকার বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব খোঁজ খবর করলে বিষয়টা সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। 'চারকোসী ঝাড়ি'র খানিক অংশ বোধহয় চম্পারণে এখনও টিকে আছে। শোনা যায় যে পুরো হিমালয়ের তরাই অঞ্চল জুড়ে চারক্রোশ চওড়া একটি ঘনজঙ্গল অঞ্চলকে সযত্নে রক্ষা করা হত। পূর্ব বিহারের এগারো বারো'শ কিলোমিটার দৈর্ঘ জুড়ে এই বনাঞ্চল বিস্তৃত ছিল। উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের তরাই পর্যন্ত ছড়ানো[৩] এই ঘন বনের কটিবন্ধ ছিল বিশাল হিমালয়ের সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে। এখনকার প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত, কোন-কাজে-না-আসা এমব্যাংকমেন্ট বা তটবন্ধগুলির তুলনায় এই দীর্ঘ, প্রশস্ত বন-বাঁধ বর্ষার পাগলা জলের তোড় আটকানোর পক্ষে অনেক বেশি কার্যকরী ছিল - এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বন্যা নিশ্চয় তখনও আসত, কিন্তু তা এমন বিধ্বংসী হত না।

আড়াই হাজার বছর আগেকার কথোপকথনে আমরা বন্যার কিছু বর্ণনা পাই। ভগবান বুদ্ধ ও এক গোয়ালার মধ্যে কথা হচ্ছিল। সেই সন্ধ্যায় গৌতম বুদ্ধ সেই গোপালকের গৃহে পৌছেছেন। কালো মেঘে আকাশ ঘন হয়ে আছে। গোয়ালা বুদ্ধকে বলছে যে তার ঘরের চাল সারানো হয়ে গেছে, ফসল কেটে তোলা শেষ। গরুগুলি

ঠিকমতো খুঁটিতে বাঁধা আছে। এখন আর বন্যার জন্য কোন ভয় নেই। যতখুশি বৃষ্টি হতে থাকুক। ভালোই হবে, নদীর দেবী দর্শন দিয়ে যাবেন। বুদ্ধ তার উত্তরে বলছেন, তিনিও তৃষ্ণার তরীগুলি খুলে দিয়েছেন খুঁটি থেকে। বন্যায় তাঁরও চিন্তা নেই কোন। এক যুগপুরুষ এক গোয়ালার কুটিরে রাত কাটাবেন নদীর ধারে। নদীতে সেই রাত্রে বান আসতে পারে কিন্তু উভয়েই নিশ্চিন্ত। আজকে কি সম্ভাবিত বন্যার আগের দিন এরকম এক নিরুদ্বেগ আলাপচারিতার কথা ভাবা যায়?

এইসব প্রসঙ্গ থেকে অন্তত এটা পরিষ্কার যে লোকে এই জলের সঙ্গে বন্যার সঙ্গে তাল দিতে জানত। এই জায়গার সমাজ বন্যায় সাঁতার দিতে জানত, তার আয়ত্ত ছিল বন্যা পার করে বাঁচবার কলাকৌশলও। উত্তর বিহারের এই সম্পূর্ণ এলাকায় বড় জলাশয় বোঝাতে হ্রদ আর চৌর বা চৌরা এই শব্দদুটি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ও বিশাল জলাশয় বিষয়ক বহু সাহিত্য পাওয়া যায়, যেমন দারভাঙা জেলার একটি বিশাল সরোবর বা হ্রদের বর্ণনায় প্রায় মহাকাব্যিক আলঙ্কারিকতা পাওয়া যাবে। একেবারে অগস্ত্য মুনিকেই সম্বোধন করে বলা হচ্ছে 'তুমি এক সময়ে গণ্ডূষে সাগর পান করেছিলে বটে, কিন্তু এই সরোবর যদি পান করে নিতে পারো তো বুঝি!' বাস্তবে সমুদ্রের বিশালতার সঙ্গে এই হ্রদের পরিসরের তুলনা হয় না, একথা সেই মানুষেরাও নিশ্চয় জানতেন। তবু যেন এই এক আনন্দময় খেলা।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ওই অঞ্চলের বড় বড় সব জলাশয় নিয়ে অনেক কাহিনীর চল ছিল।

বৃষ্টির অতিরিক্ত জলের অনেকটা চৌরগুলোয় আটকা পড়ত। পরিহারপুর, ভরওয়ারা, আলাপুরের মত সব জায়গায় লম্বা চওড়ায় দুই-তিন মাইল হ্রদও দেখা যেত। কিন্তু ধীরে ধীরে কিছু লোকের মধ্যে লোভ দেখা দিতে লাগল, যাদের মনে হল এত বড় বড় জলাশয়ে কত মাটি আটকা পড়ে নষ্ট হচ্ছে, কিছুটা জল মেরে দিলে খানিকটা বেশি চাষের জমি পাওয়া যাবে। এই চিন্তার ফলে দু চারটে ক্ষেত বেড়েছিল হয়ত কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুশো চারশো ক্ষেত বন্যার জলে বিসর্জন দিতে হয়। বন্যার জলের একটা বড় অংশ তার আগে পর্যন্ত এই প্রকাণ্ড জলাশয়গুলোতে সঞ্চিত থাকত।

ইংরেজী 'রেন ওয়াটার হারভেস্টিং', শব্দটি এখন খুব জনপ্রিয়। কিন্তু এর বহু বহু আগে থেকে এই ধরণের অনেক বড় কাজ উত্তর বিহারের মানুষরা করে আসছেন। তা হল 'ফ্লাড ওয়াটার হারভেস্টিং', বন্যার জলকে ঠিক মত লাগানোর কাজ। বড় বন্যা তখনও আসত কিন্তু তখনকার মানুষ বন্যার ক্ষয়ক্ষতিকে সবচেয়ে কম করতে সক্ষম ছিল। তালাব অর্থাৎ জলাশয়ের একটা নাম পাওয়া যায়— নদীয়া তাল। মানে সেই সব জলাশয় বর্ষার জলে নয়, বরং নদীর জলে ভরে থাকত। বর্ষার বৃষ্টিতে ভরে

ওঠা দীঘি পুকুর সারা দেশেই দেখা যায়, কিন্তু হিমালয় থেকে সরাসরি নেমে আসা নদী সব এত প্রবল জল নিয়ে নীচে নামতো যে নদী ছাপানো জলে ভরে উঠবে এরকম পুকুর কাটাটাই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ছিল। নদীর উপছে ওঠা জল অসংখ্য পুকুরে জমা হতে হতে, পরিমাণে কম হতে হতে যত নীচে নামত, বন্যার মারণ ক্ষমতার বদলে তা উপকারে পরিবর্তিত হতে থাকত। তারপর একসময়ে তা গঙ্গার শান্ত শীতল ধারার কোলে গিয়ে মিশত।

আজকের নতুন প্রজন্ম দম্ভ ভরে মনে করেন যে সমাজের লোক অশিক্ষিত, পিছিয়ে পড়া। উত্তর বিহারের বন্যা ক্রমশ নীচে নেমে পশ্চিমবাংলা হয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। একটা মোটামুটি আন্দাজ আছে, যে জলরাশি বর্ষায় বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায় তার শতকরা মাত্র দশ ভাগই বৃষ্টির জল। বাকিটা আসে বিহার নেপাল ইত্যাদি বাইরের এলাকা থেকে। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী পদ্মা, মেঘনা, যমুনা (ব্রহ্মপুত্রের স্থানীয় নাম)। শতকরা নব্বই ভাগ জল আসে এইসব নদীপথে। এইসব প্রকাণ্ড নদীর তীরে এবং নদী সঙ্গমে বাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন বাংলাদেশের মানুষরা। সেখানে নদী কয়েক কিলোমিটার চওড়া। আমাদের এখানে যেমন নদীর এক পাড়ে দাঁড়িয়ে অন্য পাড় দেখা যায়, সেরকম নয়। বাংলাদেশের এক একটি নদী দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রশস্ত।

গত দু-একশো বছরে আরো একটা খুব বড় ব্যাপার ঘটেছে, তা হল বাঁধ আর এমব্যাংকমেন্ট(পাড়বাঁধ)। নদীদের স্বভাব কিছুমাত্র না বুঝে তাদের ওপর যেখানে সেখানে ছোট থেকে বড় বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। নদীরা এধার থেকে ওধার বিপথে যেন না যায় সেই কারণে এক নতুন বিপথগামিতার পরিকল্পনা করা হয়েছে; তার নাম এমব্যাংকমেন্ট বা পাড়বাঁধ। এ জিনিস এমনকি বাংলাদেশেও হয়েছে। শত শত মাইল এই পাড়বাঁধের দৈর্ঘ্য। আর আজ আমরা বুঝতে পারছি যে পাড়বাঁধ দিয়ে বন্যা আটকানোর বদলে বরং বন্যা বেড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতি অনেকগুণ বেড়েছে। এখন কোন কোন অঞ্চলে এর একমাত্র উপকারিতা এইই দাঁড়িয়েছে যে যখন পাড়বাঁধের কারণে কোথাও ভয়াবহ বন্যা হয় ও সব দিক জলে ডুবে যায়, তখন লোকে এই বাঁধগুলির ওপরে উঠেই পরিত্রাণ পেতে পারে। যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বন্যা বন্ধ করার জন্য আজ সেটা শুধু বন্যার সময় আশ্রয় নেবার জায়গায় পর্যবসিত হয়েছে।

সেই নদীসকলের কিনারে বসবাসকারীরা কেবল যে বন্যার সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতেন তাই নয়, তাকে নিজেদের পক্ষে উপকারীও করে তুলতে জানতেন। বন্যা হওয়া ছিল অবধারিত, তা থেকেই এ দেশের অধিবাসীরা প্রচুর ধান ফলাতেন। যে

ধান এ দেশের 'সোনার বাংলা' নামকে অর্থপূর্ণ করেছিল।

কিন্তু ধীরে ধীরে সেই 'চারকোসী ঝাড়ি' চলে গেছে। চৌর আর হ্রদও গিয়েছে। অল্প জায়গা নিয়ে চাষ করার লোভ আমাদের পেয়ে বসেছে। আর এখন আমরা বন্যায় ডুবছি। গ্রামে লোকবসতি কোথায় হবে, কোথায় হতে পারবে না— তার বহু নিয়ম থাকত। চৌর-এ কেবল ফসল ক্ষেত থাকবে, বসতি হবে না— এই নিয়ম ভেঙ্গে গিয়েছে। ফলে বন্যাও তার নিজের নিয়ম ভেঙ্গেছে। ধীরে ধীরে, জনসংখ্যর চাপে হোক বা অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের কারণে, আমরা বন্যার নিজস্ব এলাকার মধ্যে নিজেদের মালপত্র রাখতে শুরু করেছি। বাড়িঘর তৈরী করে ফেলেছি। এতে নদীদের দোষ কোথায়? বাড়ির একতলা পর্যন্ত যদি জলে ডুবে গিয়ে থাকে তার মূল কারণ এই যে আমার বাড়িটা বন্যার রাস্তা জুড়ে তৈরী করা।

বন্যা ত্রাণে, অর্থাৎ খাবার কেনা,
প্যাকেট করা, সেই প্যাকেট
ফেলার জন্য হেলিকপ্টারের খরচা
আদিতে, চব্বিশ কোটি টাকা
খরচা হয়েছে। হয়তো দেখা
যাবে রুটি তরকারি মানে
খাবারের খরচ তার মধ্যে দু' কোটি।
এর চেয়ে কি অনেক ভালো
হত না যদি চব্বিশ কোটিতে
হেলিকপ্টারের বদলে সময়
থাকতে থাকতে সরকার
এই এলাকায় কমপক্ষে যে
বিশ হাজার নৌকা আছে
সেগুলি ব্যবহারের ব্যবস্থা করতেন,
স্থানীয় জেলে মাঝিমল্লাদের
উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে তাদের
কাজে লাগাতেন?
এই মানুষরা বন্যার জলে
সাঁতার দিয়ে বেড়ে উঠেছেন,
বন্যাকে এঁরা ভয়ংকর মনে করেন না।
বরং নিজেদের চেনা পরিচিতদের
মধ্যে বলেই ধরেন।

গত দু-একশো বছরে আরো একটা খুব বড় ব্যাপার ঘটেছে, তা হল বাঁধ আর এমব্যাংকমেন্ট(পাড়বাঁধ)। নদীদের স্বভাব কিছুমাত্র না বুঝে তাদের ওপর যেখানে সেখানে ছোট থেকে বড় বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। নদীরা এধার থেকে ওধার বিপথে যেন না যায় সেই কারণে এক নতুন বিপথগামিতার পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার নাম এমব্যাংকমেন্ট বা পাড়বাঁধ। এ জিনিস এমনকি বাংলাদেশেও হয়েছে। শত শত মাইল এই পাড়বাঁধের দৈর্ঘ্য। আর আজ আমরা বুঝতে পারছি যে পাড়বাঁধ দিয়ে বন্যা আটকানোর বদলে বরং বন্যা বেড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতি অনেকগুণ বেড়েছে। এখন কোন কোন অঞ্চলে এর একমাত্র উপকারিতা এইই দাঁড়িয়েছে যে যখন পাড়বাঁধের কারণে কোথাও ভয়াবহ বন্যা হয় ও সবদিক জলে ডুবে যায়, তখন লোকে এই বাঁধগুলির ওপরে উঠেই পরিত্রাণ পেতে পারে। যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বন্যা

বন্ধ করার জন্য আজ সেটা শুধু বন্যার সময় আশ্রয় নেবার জায়গায় পর্যবসিত হয়েছে। এসব বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে ভাবা দরকার। বহুদিন ধরে লোকে বলছে যে পাড়বাঁধ বা তটবন্ধ কোন কাজের জিনিস নয়। কিন্তু উত্তর বিহারে আমরা দেখেছি গত দেড়শ বছর ধরে (বন্যার ব্যাপারে) বাঁধ ছাড়া আর কোন বিষয়ে টাকা খরচাই করা হয়নি। মনোযোগই দেওয়া হয়নি।

কোশিতে বন্যা পরের বছরও আসবে। বন্যা কোন অ-তিথি নয়। তার আসবার তারিখ আগে থেকে ঠিক করা থাকে আর আমাদের গ্রাম সমাজ এই আগমনের জন্য তৈরী থাকতে জানত। এখন যত বেশি করে আমরা উন্নত হয়ে উঠছি, তত বন্যার স্বভাব, তার আসবার দিন এসব ভুলে যাচ্ছি। এবছর(২০০৪ সাল) বলা হল যে ত্রাণের জন্য খাবার দিতে অর্থাৎ খাবার কেনা, প্যাকেট করা, সেই প্যাকেট ফেলার জন্য হেলিকপ্টারের খরচা আদিতে, চব্বিশ কোটি টাকা খরচা হয়েছে। হয়তো দেখা যাবে রুটি তরকারি মানে খাবারের খরচ তার মধ্যে দু' কোটি। এর চেয়ে কি অনেক ভালো হত না যদি চব্বিশ কোটিতে হেলিকপ্টারের বদলে সময় থাকতে থাকতে সরকার এই এলাকায় কমপক্ষে যে বিশ হাজার নৌকা আছে সেগুলি ব্যবহারের ব্যবস্থা করতেন, স্থানীয় জেলে মাঝিমল্লাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে তাদের কাজে লাগাতেন? এই মানুষরা বন্যার জলে সাঁতার দিয়ে বেড়ে উঠেছেন, বন্যাকে এঁরা ভয়ংকর মনে করেন না। বরং নিজেদের চেনা পরিচিতদের মধ্যে বলেই ধরেন। তাদের হাতে কুড়ি হাজার নৌকা তৈরী থাকত, ডি.এম কিংবা অন্য কোন দফতর কিংবা এমনকি অঞ্চলে বিশ্বাসযোগ্যতা আছে এমন কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে সেই তালিকার রেজিস্ট্রার রাখা, কোন কোন গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেখানে কত খাবার প্রয়োজন পড়তে পারে, প্রয়োজনের সময় কোন কোন নৌকা কোন গ্রামে যাবে সেসব নির্দিষ্ট করে দেওয়া— এই অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো যদি সরকার ও প্রশাসন যথেষ্ট আগে করে রাখেন তাহলে বন্যায় যেখানে যেখানে ত্রাণ পৌছানো উচিত সে সব জায়গায় মানুষ রক্ষা পাবেন এবং খরচও মনে হয় চব্বিশ কোটির চেয়ে অনেক নীচেই থাকবে।

বন্যা আজ নতুন শুরু হয়নি। অনেক আগেকার সাহিত্য রচনা যদি কেউ দেখেন তবে দেখবেন এ দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রকুমারের আত্মজীবনীতেও ছাপরা জেলায় এক ভয়ানক বন্যার উল্লেখ আছে। এক ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছিল ছত্রিশ ইঞ্চি। সম্পূর্ণ ছাপরা জেলা জলে ডুবে গিয়েছিল। তখনও ত্রাণের কাজ এরকমই হয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীরা সরকারের থেকে অনেক বেশি মাত্রায়, অনেক যত্ন নিয়ে ত্রাণে নেমেছিলেন। সেই লেখাতেও অভিযোগ আছে যে সরকারি প্রশাসন

বন্যাত্রাণে বিশেষ কিছুই করেনি। আজও বন্যা আসে, একই অভিযোগ আজও শোনা যায়। ভবিষ্যতের বিখ্যাত নেতাদের রোজনামচাতেও এই একই রকম আক্ষেপ লিপিবদ্ধ থাকবে। খবরের কাগজেও ছাপা থাকবে একই রকম খবর। আমাদের যদি সত্যিই অন্য রকমের কার্যকর কিছু করে দেখাতে হয় তাহলে নেপাল, বিহার, পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। সামাজিক স্মৃতির মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে সেকালে এসব জায়গায় বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন্ কোন্ উপায় ছিল। দরকার হলে তার আদানপ্রদান করতে হবে। সেই উপায়ের সঙ্গে কিছু নতুন জ্ঞান যুক্ত করে কি তাকে আরো কার্যকরী করে নেওয়া যাবে অথবা যেমন ছিল ঠিক সেইভাবেই সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ করা যাবে— এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা ও অলোচনা হওয়া জরুরি।

প্রথম দিকে ইংরেজরা যখন এই এলাকায় জল বা বাঁধ কি এমব্যাংমেন্টের কাজ করেছিলেন তখনও তাদের মধ্যে দুই একজন দক্ষ ও সহৃদয় প্রশাসক বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন যাঁরা এ দেশের নানান বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। এ দেশের মাটি ও কৃষকদের তাঁরা বুঝবার চেষ্টা করতেন। তাঁরা নিজেদের সরকারকে বলেন যে সরকার সে সময় পর্যন্ত উত্তর বিহারের নদী ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব কাজ করেছেন তাতে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এরকম প্রামাণিক লেখাপত্র এখনও দুর্লভ নয়। কিন্তু এই সমস্যার প্রকৃত সমাধানের জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন স্বদিচ্ছা, তারপর উদ্যোগ।

তা না হলে উত্তর বিহারের বন্যা সমস্যার কোন উত্তর পাওয়া যাবে না।

১। উত্তর বাংলায় মিরিক থেকে সিলিগুড়ির পথে লিস, ঘিস্। নকশালবাড়ির মেচি। মেদিনীপুরের ডুলুং, বীরভূমের হিংলো।

২। দশ অবতারের তৃতীয় অবতার বরাহ

বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না

শশিনী কলঙ্ক কলের বিলগ্না

কেশব ধৃত শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।

নেপাল সংলগ্ন উত্তর বিহারকে বলা হয় বরাহক্ষেত্র বা বরাহী। বহুকাল ধরে তার এই নাম। এখানেই আছে বরাহ অবতারের বৃহৎ মন্দির। মনে করা হয় তুমুল বেগে পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসা নদীদের ভূমিপৃষ্ঠে সাবলীলভাবে ধারণ করেন বরাহ। তিনিই এই উর্বর ভূমির রক্ষক।

৩। দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়ি অর্থাৎ উত্তর বাংলার বিখ্যাত ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলও ছিল এই বন-বাঁধের বা 'চারকোসী ঝাড়'রই অংশ।

উন্নয়ন চিন্তা ও ভাষার ব্যবহার

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসাবধান হলে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজকর্মেও সেই অসাবধানতা প্রকট হয়ে ওঠে। 'উদারীকরণ' আজ একটি বহু চর্চিত শব্দ। অনেক ত্রুটি, অনেক বিফলতা বা অনিষ্টের কারণ হিসেবে আজ এই শব্দটিকে অভিযুক্ত করা হয়।

'উদার' আমাদের ভাষায় একটি শুভ শব্দ। আর্থিক বা রাজনৈতিক বিষয়গুলির যদি উদারীকরণ করা হয়ে থাকে তাহলে আজ ১৫বছর পর সে বিষয়টিকে যাচিয়ে দেখার দাবি কেন উঠছে? যখন আমাদের ভাবনা উদার হয়ে উঠছে, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে উদারতা দেখা যাচ্ছে, তখন আর আমাদের মনে ভয় কেন?

এর কারণ হয়তো এই যে, আমরা একটি ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সুন্দর শব্দের ব্যবহার কিংবা বলা ভালো, অপব্যবহার করেছি। আরো বড় দুঃখের কথা এই যে, আমাদের ভাষার বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক মহল— কেউ এই অপব্যবহারের দিকে একবারও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। উদারের বিপরীত শব্দ হল কৃপণ, সংকীর্ণমনা, স্বার্থপর। তাহলে কি এর আগের সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাই ছিল?— কৃপণ, সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক? সেইসব সময়ে নেহেরুর মতো শ্রেষ্ঠ নেতারা দেশকে চালনা করেছিলেন। আজ আমাদের ব্যবস্থা উদার হয়েছে, তখন ছিল অনুদার? সংকীর্ণ? কথাটা দাঁড়াচ্ছে যেন যখন আমাদের নেতারা ভালো ছিলেন তখন এই দেশের অবস্থা ছিল সংকীর্ণতাবদী, আত্মকেন্দ্রিক। আজ আজকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অনুদার নেতাদের পরিচালনায় দেশ উদার হয়ে উঠেছে। কী করে এটা হতে পারল প্রথমে সেই সমস্যাটা বুঝবার চেষ্টা করা যাক। তারপর না হয় গত ১৫বছরে ভুলত্রুটির হিসাবনিকাশ করা যাবে।

মঞ্চ যাই হোক না কেন, সেখানে বসে যদি নিজেদের মনের কথা খুলে না বলা যায় তো আগামী ১৫বছর পর হয়ত আবার এ রকম একটা ধাক্কার মুখে পড়ব আমরা।

এই সমস্যা বোঝার চেষ্টা না করলে ঠিক যে রকম আমরা প্রথমে একটা অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী চলছিলাম, পরে আবার তা থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে যেতে শুরু করেছি, এরই পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। আগেও তাই হয়েছে। দুনিয়ার এক পক্ষ আমাদের শেখাল, সব কিছু রাষ্ট্রীয়করণ কর। রাষ্ট্রীয়করণ বা nationalisation ছাড়া উন্নতির আর কোন উপায়ই নেই। আমরাও কোন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়াই সেই কথাটা তোতাপাখির মতো মুখস্থ করে নিলাম, পুরোন তোতাদের কাউকেই এ কথা শুধোলাম না যে তোমাদের কি কোন বুলি শেখানো হয়েছিল? আর কিছু না হোক তো নিজেদের ডালে বসে থাকা অন্য তোতাদেরই একবার যদি শুধিয়ে নিতাম তো অন্তত এইটুকু পরিষ্কার হত যে রাষ্ট্রীয়করণ এমন কোন একটা কবচ বা মাদুলি নয় যে যা ছোঁবে সব সোনা হয়ে যাবে। ফলে সেই ব্যবস্থাতেও খুব একটা সফলতা পাওয়া যায়নি। বহু সমস্যা রয়ে যায়, এমনকি অনেক নতুন সমস্যা তৈরীও হয়ে ওঠে। সে সব সমস্যার সমাধান কিংবা সমাধানের উপায় নিয়ে কোন কথাবর্তা না বলেই, আজ আবার এক নতুন কথা চালু হয়েছে যে সব কিছুকেই সরকারি ব্যবস্থাপনা থেকে সরিয়ে বাজারে এনে ফেল আর তারই নাম দাও উদারবাদ। এই শব্দের সঙ্গে কেবল শ্রুতিগত মিলের আলঙ্কারিকতার কারণে বলছি না, বিষয়গত ভাবেই উদারবাদকে আমাদের চিন্তার বা রাষ্ট্রব্যবস্থার 'ধার-বাদ'ও বলা যেতে পারে। নিজেদের দেশ চালানোর জন্য আমাদের বাইরের, বা অন্য দেশের থেকে ধার নিতে হচ্ছে। জেনে বুঝে, সারা পৃথিবীর সঙ্গে সমানে সমানে সম্পর্ক রেখে, নিজের প্রয়োজন মতো ধার নেওয়া— সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এটা বিশেষ অনুধাবনের বিষয় যে দুনিয়ায় যখন যে কথাটা জোরের সঙ্গে বলা হবে, কখনও সাম্যবাদ, কখনও অমুকবাদ, কখনও তমুকবাদ— আমরা যে কেবল তার বাইরে থাকব না তাই নয় বরং পুরোপুরি তার আওতার মধ্যে চলে যাব। যে দেশের মন লোহার মতো, ইস্পাতের মতো কঠিন প্রতিজ্ঞ ছিল তা এত সহজে সর্বদা গলে যায় কী করে! এ জন্যই কেবল গত ১৫-২০ বছরের নয়, এই নতুন পর্যায়ে দেশের অর্থনীতির পুরো হালচালটাই আমাদের পর্যালোচনা করা উচিত।

মধুর বা তিক্ত কোন মতামতের পক্ষ নেবার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক যে আমাদের পরিস্থিতি কি আগের চেয়ে কোন অংশে ভালো হয়েছে? যদি তা হয়ে থাকে, তার জন্য যদি কিছু লোককে মূল্য দিতে হয়, হবে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে সমাজ কখনো কখনো এত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে যে অল্প লোকের ভালো বা সুবিধার জন্য বিরাট সংখ্যক মানুষের ক্ষতি করতে নিরস্ত হয় না। উদাহরণ হিসেবে হরসুদের কথা বলা যাক। নর্মদা নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছিল। হরসুদ নামের একটি বড়

জনপদ তার জলে ডুবে যাবার কথা। হরসুদ একটা শহর নয়, ছোট কোন জনপদও নয়, হরসুদ ছিল একটি বৃহৎ জনপদ। অথচ সেটি রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থা সরকারি তরফ থেকে ২০বছরের মধ্যেও করা হয়নি।

শোনা যায় যে এই বাঁধ থেকে গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশ সেচের জল ও বিদ্যুৎ পাবে। যদি এই পরিকল্পনা থেকে বেশি লোকের লাভ হয় তাহলে সরকারকে জানাতে হবে যে ক্ষতি কত লোকের হচ্ছে। সেই সংখ্যাটি আজ গোপন করা হচ্ছে। তাদের ক্ষতিপূরণে ফাঁকি দেবার অভিযোগ উঠছে। যারা এই বাঁধ পরিকল্পনার কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেই মানুষকে সরকার আজ বোঝা বলে মনে করছে এবং সেই বোঝাকেও ঠিক মতো জায়গায় যত্ন করে রাখার বদলে যে কোন যায়গায় যেমন তেমন করে ঠেসে দেবার কথা ভাবছে। হরসুদ ডুবছে আজ, কিন্তু উন্নয়ন পন্থীদের মনে তার উচ্ছেদ ও মৃত্যু ঘটে গিয়েছে ২০বছর আগেই। সেখানকার মানুষরা ২০বছর আগেও আজকের মতই ভয় ও অনিশ্চয়তা নিয়ে ধ্বংসের প্রতীক্ষা করছিলেন।

ঠিক একই কথা পশ্চিমবাংলার মালদা জেলার গঙ্গা ভাঙনগ্রস্ত তিন লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য। ফারাক্কা ব্যারাজে গঙ্গার জল ভাগাভাগি ইত্যাদি হল। কিন্তু এর ফলে ভাঙনে মালদা মুর্শিদাবাদের ক্ষতিগ্রস্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের বিকল্প কোন জীবিকা বা জীবন যাপনের কথা ভাবাই হয়নি, বরং নানাভাবে ইসুটিকে গোপন করা, অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখনও। আজকে উদারীকরণ থেকে যদি বহু সংখ্যক মানুষের লাভও হয়, তাহলেও ক্ষতিগ্রস্ত সামান্য সংখ্যক মানুষের প্রতি অত্যন্ত বেশিরকম ভাবে যত্নশীল হওয়াই প্রয়োজন ছিল।

আজকে মানুষের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা তার বিবেকশূন্য হয়ে যাওয়া। জাতীয়করণের সময়ে আমরা জাতীয়করণের গুণগান করেছিলাম, আবার উদারীকরণের সময়ে উদারীকরণের। কোন সমস্যা হলে পুরো সমাজ তার সমাধানের পথ খুঁজবে এমন কথা ভাবাও হয় না। ছোটখাটো আন্দোলনের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল, কিন্তু যাঁরা সত্যি সত্যি বড় মাত্রায় কাজ করতে পারেন তাঁদের আন্দোলনও প্রায়ই তাৎক্ষণিক ও ওপর-ওপর বলে মনে হয়।

কোক-পেপসি এমন এক ব্যবসা, জলই যেখানে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য শিল্পোদ্যগেও জল ব্যবহার হয়— মেশিন ধুতে, মেশিন তৈরী করতে, কাপড় তৈরী করতে, কাপড় ধুতে, জুতো তৈরী করতে— প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জল লাগে। পাম্প বসিয়ে জল তুলে ব্যবহার করা এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেন স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িছে। ধরেই নেওয়া হয় যে এই ভাবেই কাজ চলবে। কাজটা বেশি দরকারী, কি কম— সে প্রশ্ন পরের।

কিন্তু কোক-পেপসি বা বোতলের জলের ব্যবসাতে উৎপাদনের মূল উপাদানই হল জল। (যেখানে মাটির নীচে জলস্তর আছে) কোনও জায়গায় অল্প একটু জমি কিনে সেখানে পাম্প বসিয়ে মাটির তলা থেকে লক্ষ লক্ষ লিটার জল টেনে তোলায় যদি আমাদের দেশের আইনে কোন বাধা না থাকে তাহলে সেটা ঠিক নয়। সরকারের সামনে এটা অবশ্যই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কোক-পেপসির এই যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক মানুষের দাঁড়ানো বিশেষ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এটা হতে পারে না যে উদারীকরণ বা বিশ্বায়নের নামে কেউ এক গজ জমি কিনে সেখান থেকে লক্ষ গ্যালন জল পাম্প করে তুলে নেবে। এতে সমাজ ও প্রকৃতি দুই-ই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কোন উন্নতির জন্য আমরা এই অবাধ লুঠের অনুমতি দিতে পারি?

নদী সংযুক্তিকরণের বিষয়টিকে আমরা বিশ্বায়নের অন্তর্গত অথবা বাইরে যেভাবেই দেখি না কেন এটি একটি স্বতন্ত্র পরিকল্পনা। ইতিহাসগত ভাবে, সময়ের দিক থেকে খুঁজতে গেলে আমরা দেখছি যে এর সূচনাকাল রাষ্ট্রীয়করণের আমলেই। সেটা ছিল নেহেরু ও কে.এল.রাওয়ের সময়।

নদীর সঙ্গে নদী জুড়ে দেওয়ার বিরাট স্বপ্ন দেখতে খুব ভালো লাগবারই সময় ছিল সেটা। আজও কিন্তু সেটিকে ভুল বলে মনে করা হয় না। জাতীয়করণ থেকে বিশ্বায়ন পর্যন্ত, কোন পরিকল্পনা যদি এমন থেকে থাকে যা দুই আমলেই গ্রহণীয় থেকেছে, সেটি তাহলে এই নদী সংযুক্তি পরিকল্পনা।

অথচ আমরা এই সহজ কথাটা বুঝতে চাই না যে, প্রকৃতির যখন প্রয়োজন হয় তখন সে নিজেই যুক্ত করে নেয়। সে সব পাঁচ-দশ বছরের বিষয় নয়, লক্ষ বছর ধরে নিজের হাজার হাজার নদীর মধ্য থেকে সামান্য কয়েকটিকে বেছে নিয়ে প্রকৃতি তাদেরকে যুক্ত করেছে। হিমালয়ের কোন এক প্রান্ত থেকে গঙ্গা নদী বয়ে আসে, অন্য প্রন্ত থেকে যমুনা। দুজনেই এরা আপন আপন পথে বহু দূর এসে তারপর এলাহাবাদের কাছে মিলিত হয়। এই নদী মিলনকে সমাজ এত গুরুত্ব দেয় যে এসব জায়গায় কেবল বর্ধিষ্ণু জনপদ নয়, সঙ্গমতীর্থ গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক পরিবেশে এগুলি বিশেষ ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। দুই নদীর উদ্ভিদ ভিন্ন, জলচর প্রাণী ভিন্ন। সেখানে নদী দুটি প্রথমে জলের নীচের স্তরে ধারার স্বভাবে কোন সমতা নিয়ে আসে। তারপর কে জানে কত দীর্ঘ সময় ধরে, কত জটিল পদ্ধতিতে শেষ অবধি দুটি ভিন্ন নদী মিলিত হয়ে এক নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করে। আজকে আমরা যে নদী সংযোগের কথা আলোচনা করছি, তাতে এই মহৎ মাধুর্যের কিছুই থাকবে না, জোড়ের জায়গাগুলি সংখ্যা দিয়েই চিহ্নিত হবে, কোন তীর্থ হিসেবে নয়। সেটা হবে নিতান্তই যান্ত্রিক কাজ। তার পরিণামও বলা যায়, যান্ত্রিকই হবে।

প্রকৃতিতে নদীর মিলন যেমন আছে বিচ্ছেদও আছে। সমুদ্রে পৌঁছাবার আগে নদী নিজেকে ভেঙে ভেঙে শত শাখায় ভাগ করে নেয়। যদি তা না হত, একটি মাত্র ধারায় নদীর সমস্ত জল একসঙ্গে সাগরে প্রবেশ করে না জানি কি প্রলয় ঘটাত! তার দীর্ঘ পথে বয়ে আনা পলির ভারই বা সে নামিয়ে রাখত কোথায়! অতি ধীরে ধীরে, জটিল প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে নদীমোহনা অঞ্চলগুলি গড়ে ওঠে। গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে, পশ্চিমা নদীগুলি আরব সাগরে পড়বার আগে নিজেদের শতধা বিভক্ত করেছে। প্রকৃতিকে বুঝে তাকে মান্য করে চলাটাই বিজ্ঞান সম্মত। এই কথা বার বার তুলে ধরতে হবে যে প্রকৃতি যতখানি দিয়েছে, সেই হিসাবের মধ্যে নিজেদের জীবন কাটানোতেই মঙ্গল।

প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আলাদা আলাদা নদী তৈরী করেছে। তার যদি প্রয়োজন না থাকত তাহলে হয়তো একটা দীর্ঘ নদী থাকত— কাশ্মীর থেকে শুরু হয়ে সেটা একেবারে কন্যাকুমারী পর্যন্ত চলে আসত। কিন্তু তা হয়নি। ভূগোলে তা সম্ভব নয়। নদী-সংযোগ পরিকল্পনায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার যদি-বা ব্যবস্থা হয়, ভূগোলের বিশেষত্বকে তো বদলানো যায় না! ভূপৃষ্ঠের যে উচ্চাবচতা তার কারণেই অধিকাংশ নদী পূর্ব দিকে গড়িয়ে যায়! তাদের পশ্চিম দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করলে ভবিষ্যতের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

গত পাঁচ-দশ বছরে বিদেশের বৃহৎ ট্রলার বাবহারকারী যে সব সংস্থাকে এদেশের সমুদ্র উপকুল অঞ্চলে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যবহৃত জাল খুব মিহি। তারা মাছ ধরার কোন নিয়ম-কানুন মানে না। আমাদের দেশীয় জেলেরা বর্ষাকালে মাছ ধরে না। তাদের জালের ফুটো অনেক বড়, যাতে ছোট মাছ ধরা না পড়ে। তারা কেবল অপেক্ষাকৃত বড় মাছই ধরতে চাইত। বৃদ্ধির যে সুদ, সেটুকুই নেওয়া নিয়ম ছিল। আসলে কখনও হাত পড়ত না। এখনকার এই জেলেরা সে সব বাছ বিচার না করে সমুদ্র কাচিয়ে ছোট বড় যা মাছ জালে লাগে সব তুলে নেয়। তারপর দরকারি বড় মাছ রেখে ছোট মাছ, আমাছা, সব মরা মাছ আবার জলে ফেলে দিয়ে সমুদ্র দূষণ তো ঘটায়ই, এই অপচয় মাছ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। আগেকার জেলেরা মাছ ধরতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তারা প্রকৃতির নিয়মগুলিকে সম্মান করতেন। মাছেদের প্রজনন সময়ে মাছ ধরা বন্ধ থাকত। মাছের জীবনচক্রের সঙ্গে, ভালো মন্দের সঙ্গে, জেলেদের নিজেদের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকত। তারা মাছ মারত, মাছ বেচত, মাছ খেত - সবই করত কিন্তু মাছের সঙ্গে তাদের এক সামগ্রিক, এমনকি সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ থাকত। মাছ কেবল কাঁচা মাল মাত্র ছিল না। আজকে বিশ্বায়নের নামে যেখানে যেখানে বড় ট্রলার দিয়ে মাছের বড়

ব্যবসা চলছে, প্রতিটি জায়গায় মাছের উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমরা মুখে সবসময় স্থায়ী উন্নয়নের কথা বলি অথচ আমাদের নিজেদের চিন্তাভাবনার মধ্যে কোন স্থায়িত্ব নেই। যখন যা বলা হয় আমরা প্রত্যেকটিতেই প্রভাবিত হই। কেউ জাতীয়করণের কথা বললে আমরা তার পেছনে ছুটি, আবার কিছুদিন পর আবার অন্য তরফ উদারনীতিবাদী বাজারীকরণের কথা বলছেন, আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে তার পেছনে দৌড়চ্ছি। যখন কেউ নদীগুলোকে একটা অন্যটার সাথে জুড়ে দেওয়ার কথা বলছে আমরা সেই কাজে লেগে যাচ্ছি, বড় ট্রলার দিয়ে মাছ ধরার কথা হলে, সেটাই করছি— একবারও কেন প্রশ্ন করছি না, যেসব দেশে এই কাজগুলো ইতিমধ্যে হচ্ছে সেসব জায়গার অবস্থা কেমন? তারা কোন সমস্যায় পড়েছে কি না? এদেশের কিছু সরকারি অফিসার, জেলে সমাজের কয়েকজন অভিজ্ঞ মানুষ গিয়ে সে জায়গায় বছরখানেক থেকে সমস্ত অবস্থাটা দেখে বুঝে আসুন, তারপর তারা যা বলবেন সেই অনুযায়ী কাজ হবে। তার বদলে আমাদের যা কিছু বলা হয় আমরা বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে তাঁর পেছনে ছুটি। এটা কেন হয়? বাজারে যা কিছু চটকদার বলে মনে হয় আমরা তার সবকিছু অনুসরণ করি। যেন থালায় পড়ে থাকা বেগুন ভাজা— থালাটা যখন যেদিকে নড়ছে তখন সেদিকে উল্টে পড়ছি।

এ এক বিচিত্র অবস্থা। আমরা এমন একটা বাজার ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে উঠেছি যার কোন নির্দিষ্ট দর্শন নেই। কোন নিজস্ব ভাবনা নেই। টাকা-ডলারের হিসেব ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্যও নেই এমনকি। অথচ আমরা একসময়ে সেই বাজারের অংশ ছিলাম সমাজ ও কৃষি যাকে নিয়ন্ত্রণ করত। সেখান থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছি। গত পনেরো বছরের উদারীকরণের ফলে এইসব চিন্তা আজ আমাদের নিজেদের কাছে খুবই জরুরি বলে মনে হয়। বাজার এ চিন্তা করবে না। আমাদের ধারক থালাটিরও বিশেষ মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে না। অন্তত বেচারা বেগুন ভাজাকে তো ভাবতেই হবে!

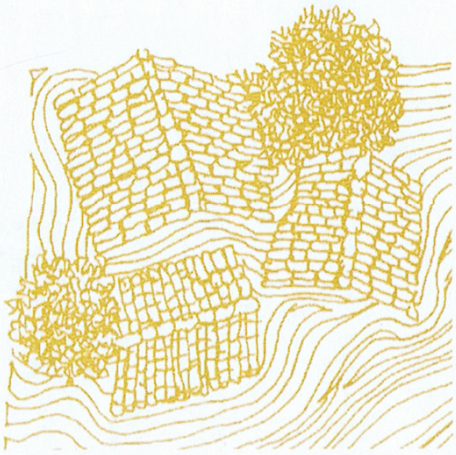

গত দু-একশো বছরে আরো একটা খুব বড় ব্যাপার ঘটেছে,
তা হল বাঁধ আর এমব্যাংকমেন্ট (পাড়বাঁধ)।
নদীদের স্বভাব কিছুমাত্র না বুঝে তাদের ওপর
যেখানে সেখানে ছোট থেকে বড় বাঁধ তৈরী করা হয়েছে।
নদীরা এধার থেকে ওধার বিপথে যেন না যায়
সেই কারণে এক নতুন বিপথগামিতার পরিকল্পনা করা হয়েছে,
তার নাম এমব্যাংকমেন্ট বা পাড়বাঁধ।
এ জিনিস এমনকি বাংলাদেশেও হয়েছে।
শত শত মাইল এই পাড়বাঁধের দৈর্ঘ্য।
আর আজ আমরা বুঝতে পারছি যে পাড়বাঁধ দিয়ে
বন্যা আটকানোর বদলে বরং বন্যা বেড়েছে
এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতি অনেকগুণ বেড়েছে।
এখন কোন কোন অঞ্চলে এর একমাত্র উপকারিতা
এইই দাঁড়িয়েছে যে, যখন পাড়বাঁধের কারণে
কোথাও ভয়াবহ বন্যা হয় ও সব দিক জলে ডুবে যায়,
তখন লোকে এই বাঁধগুলির
ওপরে উঠেই পরিত্রাণ পেতে পারে।
যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল বন্যা বন্ধ করার জন্য,
আজ সেটা বন্যার সময় শুধু
আশ্রয় নেবার জায়গায় পর্যবসিত ওয়েছে।